মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা (পর্ব-১)

শাহেদ আলী

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

[১৯৮০ সনে হোটেল পূর্বাণীতে আন্তর্জাতিক সেমিনারে ইংরেজীতে এ প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছিলেন। ড. সৈয়দ আলী আশরাফ ও ড. ইসমাঈল রাজী আল-ফারুকী প্রবন্ধের বক্তব্যের সমর্থনে বক্তব্য প্রদান করেন।]

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সম্প্রতি নবজাগরণের আলামত দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর বিপুল সম্পদের সন্ধান- নতুন আলোর দিগন্ত উন্মোচন করেছে। স্বাধীনতা মানুষকে নিজের ভাগ্য নির্মাণের ক্ষমতা এনে দেয়। কিন্তু সম্পদ না থাকলে স্বাধীনতা হয়ে পড়ে অর্থহীন। জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে যে সম্পদের প্রয়োজনে তার অবর্তমানে স্বাধীনতা জাতির ভাগ্য নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠে না, বরং একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই, বর্তমান মুসলিম বিশ্ব স্বাধীনতা এবং সম্পদের প্রাচুর্য- ঐ দুই শক্তির অধিকারী হতে পারায় এক বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ স্বাভাবিকভাবে পুনর্গঠনের তাগিদ অনুভূত হচ্ছে। এই প্রাণের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা মুসলিম বিশ্বকে একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। পাশ্চাত্যের জীবনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলছে, যে ধ্বংসকারী শূন্যতা বিরাজ করছে তার শিক্ষায় ও সমাজ ব্যবস্থায়ও ঘটেছে তারই অনিবার্য প্রতিফলন। বিশুদ্ধ টেকনোলজির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার স্বাভাবিক অনুসংগীই হচ্ছে কেবলমাত্র বৈষয়িক সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের অতৃপ্ত বাসনা। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে, তা পুঁজিবাদই হোক বা সমাজতন্ত্রই হোক বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি তথা দৈহিক ভোগ-ঐশ্বর্যের লালসাই চরম ও পরম। জীবন সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গির গভীর ছাপ সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে বিশেষ করে, যেসব মুসলিম দেশ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর হীন দাসত্বে দীর্ঘকাল কাটিয়ে হালে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের উপর তো এই প্রভাব ব্যাপকতা ও গভীরতায় বিপুল। গোলামীর শতাব্দীগুলোতে পাশ্চাত্য দর্শন এবং পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টি জোর করে তাদের গলায় ঢালা হয়েছে। দীর্ঘদিন যান্ত্রিক থেকে মুসলমানরা ধীরে ধীরে তাদের ঐতিহ্য ও জীবনদৃষ্টি বিস্মৃত হয়েছে। নিজেদেরকে কাঙ্গাল-দরিদ্র ও নীচ এবং প্রভুদেরকে বড় ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে। এখন যখন তারা নিজ নিজ জাতিকে গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করতে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা ট্রেনিং, শিক্ষা এবং জীবনের আধুনিক উপকরণগুলোর জন্য শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছে, পাশ্চাত্যের লোকেরা মনে করে বৈষয়িক ক্ষেত্রে দ্রুত সমৃদ্ধি ও উন্নতি অর্জনের জন্যে এর কোন বিকল্প উপায় আজ তাদের জানা নেই।

> কিন্তু পরিণামে পাশ্চাত্যের উপর এই নির্ভরতা সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে খুবই মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে; কারণ স্বাধীনতা মানে দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, গাড়ী-ঘোড়া হাঁকানো আর যথেচ্ছা পানাহার বা কামচর্চা নয়- স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আপন জীবনদর্শনের মজবুত নিরেট বুনিয়াদের উপর আপনত্বকে সংহত করা। কিন্তু পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও নাস্তিক সমূহ-বাদী দর্শনগুলো আর তাদের স্বাভাবিক জীবন-পদ্ধতি আমাদের অস্তিত্বের একেবারে মূলে আঘাত হানে। এগুলো আমাদের চিরকালের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মূল্যগুলোকে ধ্বংস করে দেয়, আমাদের তাহজিব, তামাদ্দুন ও জীবন-পদ্ধতির বিনাশ সাধন করে-পরিবর্তে মহত্ত্বর কিছু দান না করে চরম শূন্যতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে আমাদের পরানুকরণকারী আত্মবিশ্বাসহীন মানসিক গোলাম বানিয়ে ছাড়ে।

এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে একালের কিছু কিছু মুসলমান নিজের জীবনদর্শনে দৃঢ় ও গভীর মূল একটি জাতি ও মানব গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। বিপদের এই উপলব্ধি একটা শুভ লক্ষণ নিঃসন্দেহ। সভ্যতায় উন্নত ভোগসর্বস্ব উচ্ছৃংখল প্রভূ জাতিগুলোর সংস্পর্শে নাই। কোনো দেশে শিক্ষা দর্শন যন্ত্রপাতির বস্তু নয়। জাতির জীবন-দর্শনই দেশের শিক্ষানীতির রূপ নির্ধারণ করে, বা তার তা করা উচিত। আমাদের ব্যক্তিগত মতে উৎপাদন বা আমদানীর ও সমাজ-জীবনের সার্থকতা এবং তাৎপর্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে সঠিক ও যথাযথভাবে শিক্ষার ভিত্তি নির্ণয়ের উপর।

বলা বাহুল্য, যে শিক্ষায় সামনে একটি মহৎ এবং সুউচ্চ লক্ষ্য নেই তা কোনো শিক্ষাই নয়। শিক্ষার অবশ্যই একটা লক্ষ্য থাকবে এবং সে লক্ষ্য , সৃষ্টির মাধ্যমেই মানব জীবনের ভূমিকা ও গুরুত্বের সংগে সম্পর্ক রেখে নির্ণীত হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে কেবলই বৈষয়িক, কেবই বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা কেবলই আত্মিক কল্যাণ লাভ অথবা একাধারে বৈষয়িক, মানসিক ও আত্মিক সম্ভাবনার বিকাশ হতে পারে তার কাম্য, যা পরিণামে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় কোনো সমাজের, জাতির অথবা জনগোষ্ঠীর মৌলিক জীবন-দর্শন দ্বারা। কোন সমাজ বা জাতি যদি ধর্ম-নিরপেক্ষ, ধর্মদ্রোহী অথবা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয় তাহলে বৈষয়িক অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধিই হবে তার জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য এবং জীবন সৃষ্টির আলোকেই সে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে তার শিক্ষা ব্যবস্থা, এই দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হবে তার সাংস্কৃতিক রূপ।

কিন্তু এ-ও হতে পারে, একটি জাতি বা জনগোষ্ঠী ধর্মকেই তা উৎপত্তির এবং তার অস্তিত্বে মূল বলে বিশ্বাস করে; এক্ষেত্রে তার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতির রূপ হবে ভিন্ন। এ ধরনের জাতি জনগোষ্ঠী তার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আলোকে তার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে। এটাই স্বাভাবিক, তবে ধর্মটি যদি নেহায়েতই জীবন-বিমুখ হয়, সংসার-ত্যাগ বা সন্ন্যাসবাদ যদি ধর্মটির মূল দর্শন হয়, তাহলে এ ধরনের ধর্মে বিশ্বাসী সমাজ বা জনগোষ্ঠী এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে, যা জীবনের বাস্তবতার মুকাবিলা না করে জাগতিক বিষয় থেকে পলায়নের মনোবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দেবে; রাষ্ট্র যেহেতু জাগতিক বিষয়কে বর্জন করে চলে না, বরং জাগতিক বিষয়সমূহই যেহেতু রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডরে মধ্যে পড়ে, তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কেবলমাত্র জাগতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর জনগণের জন্য থাকে তপ-জপ, সাধন-ভজন ধর্ম বলে, এক গালে চড় দিলে আরেক গাল পেতে দাও, কিন্তু এটি যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ বাঁধায়, দুর্বল মানুষকে লুটপাট করে, পারলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, মারণাস্ত্র তৈরীর জন্য বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করে, যে অর্থে কোটি কোটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয়া যেতো তাকে তারা মানুষ মারার যন্ত্র আবিষ্কারে ব্যয় করে। কিন্তু ধর্মটি যদি সামগ্রিক জীবন-বিধান হয় অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজই যে এর আওতায় পড়ে কেবল তাই নয়, জাগতিক জীবনের পরবর্তী জীবনও তার আওতাভুক্ত হয়, তাহলে আমরা পাব একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। এক্ষেত্রে জীবনের সামগ্রিকতার পূর্ণ ও সামঞ্জস্য বিধানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

পৃথিবীতে বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা চল্লিশের উপরে। ইসলামে গভীর আস্থাশীল ব্যক্তি ও জাতি গোষ্ঠী যখন ইসলামের বিধি-বিধান মত ব্যক্তি ও সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলে তখনই তাদেরকে বলা হয় মুসলিম। আজকাল অবশ্যই ইসলামের সাথে সম্পর্ক না রেখেও অনেকে মুসলিম পরিচয়ে চলাফেরা করে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এদের মধ্যে রয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদীদের একটি দল। কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা প্রচার অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীনতার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম জীবনকে মায়া বলে গণ্য করে না। এক ধরনের সূফী-পীর-দরবেশ জীবনবিমুখীনতা প্রচার করলেও মহানবী প্রবর্তিত কুরআনী জীবনদর্শন পলায়নবাদ বা জীবন-বিমুখীনতাকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না। এ কারণে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কেবলমাত্র বৈষয়িক প্রগতি অথবা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক মুক্তি হতে পারে না।

কেবলমাত্র দৈহিক সুখ বিধান যেন মানব জীবনের পূর্ণ পরিচয় নয়, তেমনি কেবলমাত্র রূহানী অন্বেষায়ও মানব জীবনের সামগ্রিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই যে কোনো সত্যিকার ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা-দর্শনের মূলনীতিই হবে জীবনকে নৈতিক, মানবিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন।

মুসলমানদের এ বিশ্বাস এ জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরও গভীর মূল তার অস্তিত্বে টিকে থাকে, যদিও মানুষ জানে না সেই জীবনের স্বরূপ কি? বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবন পর্যন্ত প্রসারিত মানবিক অস্তিত্বের অর্থ এবং তাৎপর্যকে সেখানে রেখেই আমাদের পার্থিব জীবনবিধান পরিলক্ষিত ও প্রণীত হয়েছে। (মুসলমানদের যৌথ জীবন দর্শনের প্রতিফলনে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্যাটার্নে সংরক্ষণ এবং পোষণের জন্যে কেবলমাত্র উপরোক্ত অর্থ ও তাৎপর্যের আলোকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝতে হবে এবং রূপ দিতে হবে।)

> কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দীর্ঘকাল পশ্চিমা উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য শক্তিশালী আধিপত্য, দমন ও শোষণের ফলে মুসলমানদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে। এরা আমাদের জন্যে রেখে গেছে গোলামী মনোভাব, যার প্রভাব এখনো জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে আমাদের উপর। আমাদের চিন্তা এবং ব্যবহারিক আচরণের উপর এখনো প্রভুত্ব করছে গোলামীকালের ঐতিহ্য। পাশ্চাত্য জগত ও জীবনের যেসব লক্ষ্য এবং রূপ উদ্ভাবন করেছে আমাদের বুদ্ধি ও মেধা তাতেই নিমগ্ন রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে তার বেশির ভাগই বিদেশী পণ্য-দ্রব্যের মতো পাশ্চাত্য থেকে আমদানি। এগুলো আমাদের নিজস্ব সিস্টেম বা পদ্ধতি নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেই এগুলো প্রণীত। এগুলোর অনুকরণ এবং কার্বনকপি মাত্র। নির্লজ্জের মতো বিবেকে বিন্দুমাত্র পীড়ন ছাড়াই, আমরা পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিকায় কল্পিত ও উদ্ভাবিত এসব শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণের মাধ্যমে আমরা আমাদের শিক্ষাভিযান চরিতার্থ করার চেষ্টায় মশগুল রয়েছি। আমাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য যেহেতু বৈষয়িক উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি, তাই সে ব্যবস্থার মাধ্যমে পাশ্চাত্য এই সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে, আমরা তার অনুকরণকে সহজ পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছি।

কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যে কারখানার প্রস্তুত বিদেশী পণ্যের মতো আমাদনীর বস্তু নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। প্রত্যেক জাতির একটি নিজস্ব জীবনদর্শন ও জীবনদৃষ্টির আলোক তার বৈষয়িক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে পাবার চেষ্টা করে, তার সাংস্কৃতিক জীবনকে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। সত্যিকার শিক্ষা ব্যবস্থা একটা জাতির সত্তার অন্তর্নিহিত তাগিদেরই ফলশ্রুতি। মাকড়সা যেমন তার নাভি থেকে সুতা উৎপন্ন করে অতি চমৎকার সূক্ষ্ম জাল বুনে তেমনি শিক্ষা পদ্ধতিরও মূল নিহিত থাকে জাতির অন্তর প্রকৃতির মধ্যে।

যে কোনো জাতির শিক্ষার চরিত্র ও প্রস্তুতির ভিত্তি হচ্ছে তার ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং জীবনদৃষ্টি। সিস্টেম বা পদ্ধতি বিচ্ছিন্ন বস্তু হতে পারে না, এর সূত্র নির্মিত হয় জাতির জীবনদৃষ্টি থেকে। সেই জীবনদৃষ্টি থেকে যেসব নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় সেগুলোর সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। এ কারণে কোনো দেশে বা সমাজে একই সঙ্গে একাধিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে না। এ ধরনের অদূরদর্শী শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে অনুসরণ করা হয় সেখানে সামাজিক সংহতি এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সার্বিক উদ্যোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমাজের সদস্যরা সুস্পষ্ট একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর সংগে অপর শ্রেণীর কোনো সম্পর্ক থাকে না, ফলে সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়ে পড়ে। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা নাগরিকদের পরস্পর কাছে টানে না। তাদের নৈকট্য সৃষ্টি করে না। বরং পারস্পারিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈপরিত্যেরই জন্ম দেয়। বলা বাহুল্য, দেশের নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা-পদ্ধতিই তখন অলক্ষ্যে ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সমাজ যখন এভাবে পরস্পর বিরোধী একের সংগে অপরের সম্পর্কহীন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, মতের বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী দু'টির মধ্যেকার সম্পর্ক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচ্য।

কিন্তু একটি মাত্র লক্ষ্যে উদ্ভাবিত একটি সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা যারা অনুসরণ করে তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্যাটার্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেখানে সমাজসত্তা একে অপরের কাছে অবোধ্য, অপরিচিত একাধিক খন্ডে বিভক্ত নয়। বরং সুসংহত একটা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক ঐক্য ও সংহতির অনুকূল পরিবেশ অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি করে থাকে। এর ফলে আমরা দেখি, সামগ্রিক কল্যাণের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ সমগ্র জাতিকে একটি একক লক্ষ্যে সুসংত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয়।

মজার বিষয়, ইউরোপ যদিও বৈষয়িক উন্নতির স্বর্ণযুগে আরোহণ করেছে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যার নেতৃত্বে তর্কাতীত, তবু পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞানী, দার্শনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যহীনতায় কেবল উদ্বিগ্ন নয়, হতাশ বোধ করছেন। তারা আজ উপলব্ধি করছেন, তাদেও এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তি আজ নিঃসঙ্গ একাকীত্ব বোধে পীড়িত, দিশাহীনতায় বিমূঢ়। এর পরিণাম এই হয়েছে যে, ব্যক্তি যখন প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করছে, তখনো জীবন তার কাছে দুঃখময় যন্ত্রণাপীড়িত। এ শিক্ষা-ব্যবস্থার একমাত্র বুলিই হচ্ছে ভৎববফড়স 'মুক্তি', বাস্তব জীবনে যার অর্থ দাঁড়ায় যেমন ইচ্ছা করার অবাধ অধিকার। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত রাতারাতি ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বৈষয়িক জীবনমান উন্নত করা।

লক্ষ্য যখন তথাকথিত 'মুক্তি' তথা স্বেচ্ছাচারের অবাধ অধিকার তাই অধ্যয়নের বিষয়গুলিকে করা হয়েছে ঐচ্ছিক-যাতে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয়। একমাত্র লক্ষ্য যেহেতু ব্যক্তিত্বের এই অবাধ স্ফূরণ ও বিকাশ, তাই জীবনের কোনো লক্ষ্য বা আদর্শের আলোকে শিশুমন এবং চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রয়াসকে ক্ষতিকর গণ্য করা হয়। এর ফলে জীবনের

একটা বৃহৎ অংশ এই শিক্ষালাভে ব্যয়িত হলেও এ শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো সামাজিক অভিষ্ট ও লক্ষ্য সৃষ্টি করে না। কর্ম ও ত্যাগের জন্য তাকে অনুপ্রাণিত উদ্দীপিত করতে পারে এমন কোনো লক্ষ্য তার জীবনে না থাকায় সে ঘটনা, ইতিহাস এবং ভাগ্যের উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। পরিবেশের নিয়ন্তা না হয়ে সে পরিবেশের গোলাম হয়ে পড়ে। যে-সব গুণ ও মূল্য মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে মহত্তম মর্যাদার অধিকারী করে দ্রুত সেগুলির অবক্ষয় শুরু হয়। এ শিক্ষা তরুণ-তরুণীর আত্মায় আত্মিক ও সামাজিক মূল্য অর্জনের জন্য কোনো তীব্র আকুতি সৃষ্টি করে না। যেন তেন উপায়ে শক্তি এবং সম্পদ অর্জনের জন্যে যে-সব বৈষয়িক এবং বৃত্তিগত চাহিদা পূরণ আবশ্যক এ শিক্ষা কেবল সেগুলি পূরণেরই চেষ্টা করে। মানব আত্মার লালন-পোষণে এ ধরনের শিক্ষা সাহায্য করে না-দয়া, সেবা, পরার্থপরতা এবং ত্যাগের ন্যায় মহৎ গুণাবলীর দ্বারা মানব জীবনকে এশ্বর্যমণ্ডিত করে না। মানুষের মনস্তত্বে এর ফলে সৃষ্টি হয় এক 'বিশাল আমি' যার আড়ালে গোটা সৃষ্টিটাই ঢাকা পড়ে যায়। সে নিজেকে ছাড়া আর কিছু দেখে না, জানে না, 'সবার উপরে আমি সত্য' এই তার কাছে একমাত্র সত্য। আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয় মার্জিত আত্মস্বার্থ-প্রকৃতপক্ষে যা স্থুল আত্মসর্বস্বতারই নামান্তর।

সূত্রঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ২০০২, অধ্যাপক শাহেদ আলী সংখ্যা।

দ্বিতীয় পর্বঃ মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সমস্যা

শাহেদ আলী